প্রতিধ্বনি the Echo
A Journal of Humanities & Social Science
Published by: Dept. of Bengali
Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: www.thecho.in

গুণময় মান্নার 'মুটে' : সত্যের আলোকসন্ধানী

ড. প্রিয়কান্ত নাথ

Abstract

Novel is a time-art. Gunamoy Manna writes novel, express truth with the help of time. Gunamoy Manna is an anti-establish writer. He enlightens those people, whom live for truth and life. 'Mute` is one of the most extra-ordinary novel in history of Bengali novel, because most popular religious and cultural festival 'Gaajan` and its philosophy is the main theme in this novel. The main character Sudhir overcomes all the problems through his faith on lord Shiva.

১

"Novel is the best form of art to express the truth of life"- হেনরি জেমস ১৮৮৪ সালে একথাটি বললেও আজ অবধি তা সমানভাবেই গ্রহণযোগ্য। উপন্যাস এমন এক শিল্পমাধ্যম, যা চরিত্রের মধ্য দিয়ে সমাজের ভেতরে প্রবেশ করে, সময়কে আগাপাশতলা নিরীক্ষণ করে, সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে প্রশ্ন করে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ – স্বত্তাকে উদ্‌ঘাটিত করে। সৃষ্টিধর্মে প্রগতিশীল এই শিল্পমাধ্যম। আর সময় নিরন্তর প্রবহমান বলেই প্রতিমুহূর্তেই পরিবর্তনশীলও বটে। সেই সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সময়ের সহযাত্রী উপন্যাসও জীবনকে নানা বীক্ষায়, নানা মাত্রায় ছুঁতে চায়। তাই দেখি, উনিশ শতকের ভিকটোরিয় সমাজ শুচিতার মাত্রা অতিক্রম করে বিশ শতকের প্রথম দশকের বাংলা উপন্যাস যেমন মানুষের মনের কথাকে ছুঁতে চাইল, পরবর্তীতে তেমনি পল্লীবাংলার মানুষের জীবনের আস্তিত্বিক আবহকেও ধরতে চাইল। আমরা লক্ষ্য করলাম, এরপরই সে আবার রাঢ় বাংলার সংকটকে সময়ের ওঠা পড়ার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে শুরু করল। আর স্বাধীনতা পরবর্তী কালে উপন্যাস আরও বিস্তারিত জীবনযাপনকে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের বাস্তবতার আধারে স্থাপিত করে বহুমাত্রিকতার দিকে এগিয়ে গেল। মানুষের ভাবাদর্শগত অবস্থান, অর্থনৈতিক টানাপোড়েন, সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাত, সাংস্কৃতিক অবক্ষয়, প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা ও অপ্রাপ্তির হতাশাও তার বহুমুখী আধারে স্থাপিত হলো। ঔপন্যাসিকরা জীবনকে দেখতে চাইলেন নানা ক্ষেত্রে- মানুষকে ধরতে চাইলেন নানা পটে। গুণময় মান্না সমৃদ্ধ থেকে আরও সমৃদ্ধতর হয়ে ওঠা সেই বাংলা উপন্যাস জগতে নতুন সংযোজন ঘটালেন শ্রমিক কৃষকের মাটি সম্পৃক্ত জীবনচর্যার অতিবাস্তব রূপচিত্র অংকন করে।

গুণময় মান্নার জন্ম শনিবার ৭ই চৈত্র, ১৩৩১; ২৫ শে মার্চ, ১৯২৫। জন্মস্থান - মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পূর্বে ঘাটাল মহকুমা শহরের পার্শ্ববর্তী এক অজ পাড়াগাঁ আড়গোড়া। দীননাথ মান্না ও প্রাণবালা মান্নার সপ্তম তথা সর্বকনিষ্ঠ সন্তান গুণময়। মাত্র চার বৎসর বয়সেই বাবার মৃত্যুতে তাঁর লেখাপড়া শুরু হতে কিছুটা দেরী হলেও লেখাপড়ায় আগাগোড়া অত্যন্ত মেধাবী গুণময় ১৯৪৯ সালে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন ইকোনমিক্স অনার্স নিয়ে। পাশাপাশি বাংলা বিষয়ে পান বঙ্কিমচন্দ্র স্বর্ণপদক ও স্যার আশুতোষ জন্মবার্ষিক পুরস্কার। সেই সুবাদেই ১৯৫১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা নিয়ে এম.এ. পাশ করেন। এম.এ. পড়ার সময়েই উমা মান্নার সাথে তাঁর বিয়ে হয়। কন্যা সুস্মিতা রায় এর জবানিতে তাঁর বাবার ছিল 'দৃঢ় ব্যক্তিত্ব, সুগভীর চিন্তাশক্তি, স্পষ্ট সুন্দর বাচনভঙ্গি, সুললিত কণ্ঠস্বর।' ১৯৬৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই পিএইচ. ডি. উপাধি লাভ করেন 'রবীন্দ্র কাব্যরূপের বিবর্তন রেখা' শীর্ষকে।

তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় ১৯৫২ সালে ঘাটাল বিদ্যাসাগর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে। মধ্যে কিছুদিন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করে ১৯৯০ সালে বহরমপুর গার্লস কলেজ থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। কৃতী অধ্যাপক হিসেবে সম্মানিত গুণময়ের ঘড়ির কাঁটার সাথে সময় মেলানো নিয়মনিষ্ঠা যেমন ছিল, তেমনি বাচনভঙ্গি ও কণ্ঠস্বরের জন্যও সুখ্যাতি ছিল। অবশ্য স্কুল-জীবন থেকেই খেলাধুলা, আবৃত্তি, অভিনয়ের জন্য প্রশংসিত হয়েছেন তিনি। লেখালেখির হাতেখড়িও হয়েছিল ঘাটাল বিদ্যাসাগর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পড়ার সময়েই। তাঁর প্রথম মুদ্রিত গল্প 'অভিজ্ঞান' প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালে 'পরিচয়' পত্রিকায়। প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'লখীন্দর দিগার' (১৯৫০)। একে একে প্রকাশিত হয় 'জননী' (১৯৫৫), 'কটা ভানারি' (১৯৬০), 'জুনাপুর স্টীল' (পূর্বখণ্ড - ১৯৬০, উত্তরখণ্ড-১৯৬২), 'বিধি বিহঙ্গ' (১৯৬৬), 'অসামাজিক' (১৯৭২), 'শালবনি' (১৯৭৮), 'ঘরানা' (১৯৮৪), 'পঞ্চকৌণিক' (১৯৮৯), 'মুটে' (১৯৯২), 'গঙ্গা প্রবাহিনী' (২০০৬) প্রমুখ উপন্যাস; তিনটি প্রবন্ধগ্রন্থেরও ('রবীন্দ্রনাথ', 'রবীন্দ্র কাব্যরূপের বিবর্তন রেখা', 'রবীন্দ্ররচনার দর্শনভূমি') তিনি রচয়িতা। বাংলা উপন্যাসের শিল্পাঙ্গিক নিয়েও মনশীল ভাবনাচিন্তা করেছেন তিনি। নিয়মনিষ্ঠ ও সুশৃংখল এই শিল্পী জীবন-শৃংখল ভেঙ্গে পরলোকে যান ২৮ শে এপ্রিল, ২০১০-এ।

২

উপন্যাস সময়ের শিল্প। সেই সময়ের সংকেতকে ঔপন্যাসিক ধরতে চেষ্টা করেন নানা দ্বিবাচনিক আবহে। ভাবাদর্শ ও শিল্পস্বভাব, শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও শ্রেণীসংগ্রাম, তথ্য ও তত্ত্বের মেলবন্ধন, রাজনীতি ও সমাজ, বাস্তব ও রূপক, সত্যের বিকাশ ও জীবনাদর্শ, নিরপেক্ষতার কৌশল ও আঙ্গিক, শোষিত শ্রেণীর অস্তিত্ব ও চিন্তাচেতনার বিকাশ - এই সমস্ত কিছুর ধারাবাহিক ব্যঞ্জনাগর্ভ উপস্থাপনার দিকে লক্ষ্য রেখে এগোতে হয় ঔপন্যাসিককে। খুব কম সংখ্যক ঔপন্যাসিকই জীবনের প্রতিবেদনকে এই শিল্প সার্থকতায় মণ্ডিত করতে সক্ষম হন। গুণময় মান্না সেই বিরল ধরণের লেখন - যিনি এই কারুকৃতিতে সিদ্ধহস্ত। প্রথম উপন্যাসেই সেই মাত্রা ছুঁয়ে যেতে পারেন গুণময়।

"তেরশো পঞ্চান্ন সালের সতেরই অগ্রহায়ণ সকাল বেলা" (পৃঃ ১) - স্বাধীনতা প্রাপ্তির আনন্দ উদ্বেলতা মিলিয়ে যেতে না যেতেই সময় ও পরিসর কীভাবে নতুন নির্মোক তৈরী করে - গুণময় তাকে ধরতে চান জীবনদৃষ্টি দিয়ে। স্বাধীনতার পর-পরই সমাজবাদ বিরোধী সংগ্রাম যখন গ্রামীণ সামন্ততন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় প্রতাপের যোগসূত্রের বিরুদ্ধে জেগে উঠছে; সেসময় মেদিনীপুর জেলার অখ্যাত একটি গ্রামে (আমধেড়ে) কীভাবে তার ছায়া পড়ে এবং অবশ্যম্ভাবী আলোড়ন ওঠে - তারই আলেখ্য এই 'লখীন্দর দিগার' নামক উপন্যাস। সে অভিঘাতে আলোড়িত হয় গ্রাম-বাংলার কৃষক লখীন্দর দিগার। একান্ন বছর বয়স্কের লখীন্দর অনুভব করে, দেশ স্বাধীনতা পেলেও দেশের চাষী-মজুর-শ্রমিকদের অবস্থার/অবস্থানের কোনো পরিবর্তন

হয় নি। শাসন প্রক্রিয়া একই আছে – শাসক বদলে গেছে শুধু। আর পরিবর্তন হয়েছে মানুষের। সে অনুভব করে "মানুষ আগের মতো আর নাই। আজকাল মানুষের মাথার ঠিক নাই। মানুষের মনুষ্যত্ব নাই" (পৃঃ ২৫)।

কিন্তু নিজস্ব অভিজ্ঞতালব্ধ জীবনাদর্শ দিয়ে লখীন্দর সবাইকে জানাতে চায়, সবাইকে নিয়েই ভালো কাজ করতে হয়। ভালো কাজের জন্য, অর্থাৎ, সামূহিকের জন্য ব্যক্তি-স্বার্থকে দূরে সরিয়ে রেখে সবাইকে এক হতে হয়। এই আপাত সরল কথাগুলি কিন্তু জীবনে এতো সহজে কেউ মেনে নেয় না। কেউ বা মান্যতা দিতে চায় না। এখান থেকেই শুরু হয় ব্যক্তি-সমাজ-শ্রেণী-রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তের পাক। গুণময় আসলে আলোচ্য উপন্যাসের পরতে পরতে সন্ধান করেছেন এইসমস্ত জটিল, অদৃশ্য কূটাভাসগুলিকে। ফলে তাঁকে মেদবহুল বাস্তব বর্জিত কাহিনির মায়াজালের ফাঁদ পাততে হয় নি। ফলত তপোধীর ভট্টাচার্য বলবেন ---

"কৃষক আন্দোলনের প্রেক্ষিতে একদিকে শোষকবর্গের ধূর্ত অবস্থান ও শ্রেণী সম্পর্কের নানা টানাপোড়েন এবং অন্যদিকে নিম্নবর্গীয়জনেদের প্রস্তুত ও অপ্রস্তুত অংশের সম্পর্কগত কৌণিকতা ও শ্রেণী-চেতনার ক্রমিক বিকাশ উত্থাপিত হলেও তা কখনো ঔপন্যাসিকতা থেকে স্খলিত হয় নি।"[১]

শুধু 'লখীন্দর দিগার'ই নয়; আমরা লক্ষ্য করি, গুণময় তাঁর প্রায় কোনো উপন্যাসেই মধ্যবিত্ত-জীবননির্ভর মনোরঞ্জনকারী কাহিনির মায়ায় প্রলুব্ধ হন নি। তাঁর ঔপন্যাসিক সত্তায় সামাজিক অস্তিত্বের এক প্রবল আগ্রহ আমরা লক্ষ্য করি যেমন 'কটা ভানারি' (যারা ধানসেদ্ধ শুকনো করে ভেনে বেসাতি করে, তাদের কাহিনি) অথবা 'জুনাপুর স্টীল' (কারখানার 'খাঁটি শ্রমিক' শিবলাল দাগ আছে এই কাহিনির কেন্দ্রে) কিংবা 'শালবনি' (শাঁওতাল জনজাতি গোষ্ঠী ও মাহাতো-মেয়ে শামলীর জীবন সংগ্রাম এই উপন্যাসের কেন্দ্রে আছে) উপন্যাসে; তারই ধারাবাহিক কিন্তু স্বতন্ত্র ভাবনা চিন্তার বহিঃপ্রকাশক 'মুটে' উপন্যাস।

গুণময় মান্নার রচনায় আমরা লক্ষ্য করি, যারা প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় আমাদের চোখের সামনেই ঘুরে বেড়ায়, অথচ আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না – তাদেরকেই তিনি উপন্যাসের কেন্দ্রে নিয়ে আসতে চেয়েছেন। 'গদ্যের সৌন্দর্য' নামক সাহিত্যতত্ত্ব গ্রন্থে গুণময় উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা অনুযায়ী গদ্য রচনাকে যে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন : বর্ণনাত্মক গদ্য, বিশ্লেষণাত্মক গদ্য, আবেগাত্মক গদ্য; সেই সূত্র মেনে আমরাও তাঁর রচনায় লক্ষ্য করি, বর্ণনাত্মক গদ্যের আধিক্য। গ্রাম থেকে গ্রামান্তর, কৃষক থেকে কারখানা, শ্রমিক – সর্বত্রই তাঁর দৃষ্টি সজাগ ও সহমর্মীর। এবং তাঁর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য, নিজের ও পারিপার্শ্বিকের জীবনযাপন থেকেই তিনি সংগ্রহ করে নেন উপন্যাসের উপাদান ('পরিচয়' পত্রিকায় 'শালবনি'র সমালোচক লিখেছিলেন--- 'মেদিনীপুরের জনজীবন গুণময়বাবুর নখদর্পণে')। সরাসরি কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত না হলেও ১৯৯৭ সালে 'বঙ্কিম পুরস্কার' বিজয়ী এই ঔপন্যাসিকের উপন্যসে মার্কসীয় মতাদর্শ কিছুটা ছাপ ফেলেছে বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে। যদিও শেষপর্যন্ত তাঁর প্রায় প্রতিটি উপন্যাসই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কিংবা অর্থনীতি-নির্ভর শ্রমিক আন্দোলনের পটভূমিতে মানুষের উত্তরণই অভিলক্ষিত হয়। এই মানবসাম্যে প্রত্যয়শীল হওয়ার ফলে তাঁর রচনায় পাই আমরা এক বিশেষ মানবতাবোধ। আর পেশায় যারা মুটে, তাদের নিয়ে বাংলায় লেখা উপন্যাস তো দ্বিতীয়রহিত।

৩

সত্তার সংজ্ঞা সন্ধানী উপন্যাস নামক শিল্প মাধ্যম তাই বার বার নির্মাণ করতে চায় নতুন জগৎ। যেমন, উপন্যাসের নায়কের প্রচলিত সংজ্ঞাকে নতুন করে তৈরি করতে চান গুণময় মান্না তাঁর 'মুটে' উপন্যাসে। যার,

নাম : সুধীর সাঁতরা
পিতা : অধীর সাঁতরা
বয়স : প্রায় পঁঞ্চাশ
আকৃতি : দীর্ঘ
নিবাস : প্রতাপপুর গ্রাম
কর্মস্থল : ঘাটাল শহর
পেশা : মুটে।

মেদিনীপুরের শিলাই নদীর তীরে ঘাটাল বাজারের কথা উল্লেখ করে লেখক উপন্যাসের স্থানিক ভিত্তিভূমি নির্দিষ্ট করে নেন প্রথমেই। মেদিনীপুর জেলার অন্যতম এক প্রশাসনিক মহকুমা শহর ঘাটাল । ১৮৫০-এ সৃষ্টি। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য ঘাটাল শহর ও তার পাশাপাশি অঞ্চল ধীরে ধীরে এক সমৃদ্ধ জনপদ হয়ে ওঠে। ইংরেজদের অত্যাচারে তার মধ্যেও তৈরি হয় নানা কূটাভাস। পাশাপাশি বন্যা ও দাঙ্গাও ঘাটাল শহর ও তার সন্নিহিত অঞ্চলকে প্রায় শাসক ও শাসিতের দ্বান্দ্বিক বিন্যাসে প্রতিষ্ঠিত করে নেয়।

তারাশঙ্কর যেমন তাঁর দৈনন্দিন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-লব্ধ জীবন-বাস্তবতাকে তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু করেছিলেন, তেমনি আমরা দেখি, গুণময়ও বিশ্বাস করেন, 'উপন্যাস মাত্রেই চলমান জীবনের ছবি। ..... বিশেষ কালের সেই পরিবর্তমানতা বিশেষ লেখকের মানসিকতায় যে কাহিনিতে রূপ নেয়, তাই উপন্যাস' ('সাক্ষাৎকার', 'অঙ্গীকার')। 'মুটে' উপন্যাসেরও আগে, ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত তাঁর 'কটা ভানারি' উপন্যাসেও তিনি ঘাটাল ও সন্নিহিত অঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষদেরকে কাছ থেকে দেখেন এবং তার শিল্পিত রূপ দেবার প্রচেষ্টা করেন। বস্তুবাদী জীবনের সাথে জীবনদর্শনকে মিলিয়ে দেবার ক্ষমতাধর লেখক গুণময় 'মুটে' উপন্যাসেও একটি বিশেষ স্থান কালের জীবিকা ও মানুষের দ্বান্দ্বিক জীবনের ব্যক্তি ও সামাজিক আততিকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

সুধীর ঘাটাল বাজারে মুটেদের 'খাতে' সর্দার ভীম পাইনের পর দ্বিতীয় স্থানে আছে। উপন্যাস শুরুর পর পরই অবশ্য সেই হবে সর্দার। হবে মুটে ইউনিয়নের জোড়ের সম্পাদক। দায়িত্বশীলতার পাশাপাশি সবল শরীর ও সুস্থ মনেরও অধীকারী সে। স্ত্রী কুসুম আর এগারো বছরের মেয়ে সরলাকে নিয়ে আপাত-সুখের সংসার তার। শুধু তাই নয়, তার বিষয়ে আরও কিছু জানার অবকাশ আছে আমাদের। তা জানাবেন ঔপন্যাসিক : "সুধীর পেশায় মুটে, পৈতৃক বিঘে তিনেক জমিতে চাষবাসও করে, যদিও বাপের মতো মানুষ খাটে না – কিন্তু সে করিয়ালি ছাঁদে তরজা গানও করে" (পৃঃ ১০)।

কিন্তু জীবন তো একরৈখিক নয় কখনও, নয় একবাচনিক। মুট বয়ে বয়ে যাদের মেরুদণ্ড বাঁকা হয়ে যায়, কিংবা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করে দু-পাঁচ টাকা পেয়ে যাদের জীবনধারণ করতে হয়; তারা তো অন্য কিছু অনুভব করারও ফুরসৎ পায় না। কিন্তু তারই মধ্য থেকে ভেসে ওঠে কখনও কখনও অনিয়মের বার্তা। তারা বলতে পারবে না কিছুই, কিন্তু জেনে নেবে –

"ধনীদের কেউ নিয়ম মানবে না, কেউ ট্যাকসো দেবে না। শুধু কি ঘোষ বাবুরা? – সব বাবুই তাই" (পৃঃ ২৩)।

তাই সময় ও পরিসরের ঘাত-প্রতিঘাতে সুধীরের মনে যে সমস্ত ঘটনা দাগ কাটত না, এখন সেগুলোই রেখে যায় গভীর ছাপ। দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্যেই অতএব আসে নানা চড়াই-উৎরাই। অসংখ্য চোরাবালি। যে আবেগ সুধীরের মনকে কাজ করে, সেই আবেগেই সে বলে, যদি মালিকের পয়সা সে নেয়, তবে গায়ে-গতরে খেটে তার ষোলো-আনাই উসুল করে দেবে। কিন্তু দিন বদলাচ্ছে, বদলাচ্ছে চিন্তা-ধারাও। তাই কানাই মণ্ডল বলে : "তমার মুটে খাতের কাজ, বছরে তিনশ' ষাট দিন, বাবুদের মাস-ভর কাজ, মাস কাবারি মাইনা, আর আমাদের? যেদিন মুনিষ খাটা সেদিন পয়সা, কেউ মুনিষের পারমেন্ট চাকরি দেয়? রোজের মুনিষ রোজ লাগায়। বছরে ক'মাস আমরা খাটনি পাই, বল? ....." (পৃঃ ৫২-৫৩)।এ কথাই প্রবীর বুঝাতে চেয়েছিল সুধীরকে। বলেছিল : ".....ওরা সব স্বার্থের ডিপো, ঘোলা জলে মাছ ধরতে এসেছে ....." (পৃঃ ৪২)।

প্রবীর – তীক্ষ্ম কিন্তু স্থির চোখের অধিকারী প্রবীরকে সুধীর তার সাধ্যমতো পিতৃস্নেহ দিয়ে

বড় করে তুলেছিল। লেখাপড়া শিখিয়েছিল, চাকরিও যোগাড় করে দিয়েছিল। কিন্তু যখন "কিছুদিন আগে এ রাজ্যে পুরাতন সরকার বদলে গিয়ে নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সরকার এসেছে" (পৃঃ ১৩) এবং পুরাতন সরকারের আমলেই রাজনৈতিক কারাবন্দি করে রাখা প্রবীরদেরকে নতুন সরকার ছেড়ে দিয়েছে (সন - তারিখের হিসেবে ১৯৭৭-৭৮ সাল); তবুও প্রবীরদেরকে আত্মগোপণ করে থাকতেই হয়। কেননা, সময়টা তখন সত্যিই বড় অসময়। অর্থাৎ, 'মুটে' সেই সময়ের কথা তার শরীরে ধরে রাখতে চাইছে, যখন পুরনো দিনবদলের প্রত্যাশায় নতুন প্রত্যয়ে প্রবীররা তাদের যৌবনকে উৎসর্গ করেছিল। সাধন চট্টোপাধ্যায়ও বলেন তাই :

"'মুটে' উপন্যাসের কাল প্রথম বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় বসবার অব্যবহিত পরেই, যখন জেল থেকে নকশাল বন্দীদের মুক্তির প্রশ্ন সরকার বিবেচনা করেছেন। সুধীরের সন্তান প্রবীর এমনই একজন রাজনৈতিক কর্মী, যিনি পরিবার বিচ্ছিন্ন। বাম সরকার ক্ষমতায় এলেও প্রকাশ্যে ফিরে আসছেন না। বাবা ও ছেলের মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব উপন্যাসের সমগ্র অঞ্চল জুড়ে আছে ....."[২]

সময় শুধুই বদলাচ্ছে না, আসলে হয়ে উঠছে আরও জটিল। সুধীরের জবানিতে শুনি তাই আমরা : "ইটা চিরকালই হয়ে আসছে, আগের দিনে ছিল মুচি মেথর বাগদি কাহার, এখনো সেই রকম আছে। তবে তার ভোল পাল্‌টিছে। এরা বলে, মজুর কৃষক ..... আছে ছিল রাজা, জমিদার, এখন হইছে ধন ধনী, পার্টির নেতা ....." (পৃঃ ১৪০-১৪১)। যন্ত্রণার এই পাক থেকে প্রবীরকে রক্ষা করতেই সন্তানের মাঙ্গলাকাঙ্খায় সুধীরের বাবা শীতলানন্দের থানে 'ভক্তে' হওয়ার বাসনা প্রকাশ। অবশ্য এর আগেও সুধীর আরো দু'বার 'ভক্তা' হয়েছিল এবং সুধীরের বাবা অধীরও শিবের গাজনে 'ভক্ত' হয়েছিল।

৪

তিনটে পর্বে বিন্যস্ত (যন্ত্রণার পাক, তপস্যার আগুন, উত্তরণের দ্যুতি) এবং চুয়ান্নটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে (২৭টি পরিচ্ছেদ, অর্থাৎ উপন্যাসের মোট পরিচ্ছেদের অর্ধেক) অতএব আমরা পাই গাজনের বিস্তৃত বিবরণ। লক্ষণীয়, আমরা বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী', তারাশঙ্করের 'গণদেবতা' ও 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসেও রাঢ়বঙ্গের গাজনের প্রসঙ্গ পেয়েছিলাম; তবে তা গুণময়ের মতো এতো বিস্তৃত পরিসরে নয়। তবে এতো বিস্তৃত পরিসরে হলেও আমাদের কাছে তা কখনোই শুভময় মণ্ডলের মতো 'অপচয়' বলে মনে হয় না। বরঞ্চ আমরা দেখি, লোকজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক যোগাযোগ থাকার সুবাদে লোকসংস্কৃতির এই বিশেষ পর্বটি উপন্যাসকে একটা আলাদা মাত্রা দান করেছে। সেখানে অখ্যাত ব্রাত্যজনও নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ বলে ভাবতে পারে।

মহাবিষুব বা চৈত্র সংক্রান্তিতে, অর্থাৎ বাংলা বছরের শেষ দিনে বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে শিবকে উপলক্ষ করে যে উৎসব পালিত হয়, তা উত্তরবঙ্গে 'গম্ভীরা', পূর্ববঙ্গে 'চড়ক', রাঢ় বাংলায় 'গাজন' নামে পরিচিত। তাৎপর্যপূর্ণ, এই উৎসব সামাজিকভাবে তথাকথিত নিম্নবর্ণ বা অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যেই বহুল প্রচলিত। গাজন অর্থাৎ গাজন বা গান (উদ্দেশ্যে গীত)। এই

"শিবের গাজন বা নীলের গানে অংশগ্রহণকারী ভক্তদের কারো, হয় আগে থেকে মানত থাকে, নতুবা কারো পূর্বপুরুষ থেকে এরূপ ভক্ত হবার রেওয়াজ রয়েছে। চৈত্রমাসের শুরু থেকেই তারা ভক্ত্যা সেজে শিবের গাজনে অংশগ্রহণ করে।"[৩]

--- এই কঠিন ব্রতে তারা সামিল হয় শস্যকামনা, নীরোগ থাকা কিংবা সন্তানের মঙ্গল আকাঙ্খায়। শুধু তা-ই নয়;

"প্রবঞ্চিত, হাড়ভাঙা খাটুনিভরা জীবনে কীভাবে ধর্মকে তারা প্রধান অবলম্বন হিসেবে আঁকড়ে ধরে, তার থেকেই নিষ্কাশিত করে নেয় জীবনযাপনের আনন্দ, সন্তাপ বা অনুতাপ থেকে মুক্তি, কিংবা বিনোদন - গুণময় মান্না তার তন্নিষ্ঠ ছবি এঁকেছেন।"[৪]

ঢাকে কাঠি দেওয়া থেকে শুরু করে সংকল্প গ্রহণ, কৃচ্ছ সাধনের কঠিন পর্ব, দেউল তৈরি করা, প্রণাম-সেবা, বড় হিঁদোলা, তরজা গান, মেলা, কাঁটা গড়েন - গাজন নিয়ে মেতে ওঠে গ্রামের সবাই। প্রেতভোগের অনুষ্ঠানে শিবলিঙ্গে জল ঢালতে ঢালতে "কুমারীরা শিবের মতো স্বামী প্রার্থনা করে, এয়োরা পরজন্মে সেই রকম স্বামীই চায়, ইহজন্মে স্বামীপুত্রের কল্যাণ কামনা করে। কেউ আত্মীয় পরিজনের রোগমুক্তি কামনা করে" (পৃঃ ২২৬)। পাটেভক্তের স্ত্রী কুসুম শিবের মাথায় জল ঢালতে গিয়ে যখন উচ্চারণ করে, 'বাবা মেয়ের ভাল কর, ছেলের ভাল কর .....', সে-রাতেই প্রবীর ছুরিকাহত হয়। কিন্তু অনন্ত 'ধ্যায়েন্নিত্যং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রবতংসং' শিবের ভক্ত সুধীর ভেতরে ভেতরে বিচলিত হলেও বাইরে সহ্যশক্তির অসীম পরীক্ষা দিয়ে চৈত্র সংক্রান্তির শেষ দিন, অর্থাৎ চড়কের কাজে কোনো ব্যাঘাত হতে দেয় না। ফলে চড়কের খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি কাজের বিবরণ আমরা পেয়ে যাই উপন্যাসে। যেমন পাই ভারা বাঁধার কাজের বিবরণ, তেমনি পাই মটুক বানানোর বিবরণ। আছে তক্তারাখা কিংবা সঙ-এর মতো প্রায় হারিয়ে যাওয়া লোকসংস্কৃতির ধারা। দারুব্রহ্ম শালবৃক্ষকে সাক্ষী রেখে অস্থির-ভঙ্গুর-অনিশ্চিত জীবনযাত্রাকে কঠিন সংকল্পের মধ্যে দিয়ে সহজ-সুন্দর-স্বাভাবিক বৃত্তে নিয়ে আসতে চায় শিবের ভক্তরা।

৫

আসলে ঔপন্যাসিক মানুষের জীবনের পথের সমস্ত কাঁটাকে বর্ষশেষে উপড়ে ফেলতে চান। তাই চড়কের বিস্তৃত বিবরণের মধ্যেও অত্যন্ত সূক্ষভাবে কাহিনির রেখাপথকে ধরে রাখেন। বাচনের ভেতরে নিশ্চিতভাবেই থেকে যায় পরাবাচনের দ্যুতি। তাই তৃতীয় পর্বের শীর্ষক হয় 'উত্তরণের দ্যুতি'। আমরা তাই পাঠকৃতিতে যেমন পাই বর্ষারম্ভের নতুন শষ্যের ঘ্রাণ, তেমনি পাই দ্বিতীয় পর্বের প্রয়োজনীয়তাও : "সন্ন্যাসীরা সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার জন্য নয়। গাজনের দিনগুলো শেষ হবার পরই আবার তাদের ফিরে আসতে হয় সংসারেই। সংসারের দ্বন্দ্ব-বিরোধ আগেও ছিল, এখনো আছে, পরেও থাকবে। কিন্তু সন্ন্যাস-প্রত্যাগত মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেছে, নতুন প্রত্যয়ে উদ্বুদ্ধ মন নিয়ে এখন অহরহ তার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে" (পৃঃ ২৭৭)।

তৃতীয় পর্বের শুরুতেই খণ্ডসময় তাই মহাসময়ের ইশারা নিয়ে আসে - "আজ পয়লা বৈশাখ। ..... শুভ নববর্ষের সূচনা" (পৃঃ ২৭৬)। সূচনা আসলে পূর্ণতার - রিক্ততা ঝরিয়ে। সূচনা আসলে মিলনের - বিচ্ছেদ ঘটিয়ে। সূচনা আসলে উত্তরণের - অবরোহণ পেরিয়ে। আর উপন্যাস যেহেতু ব্যক্তিচেতনার সাথে যৌথ নিশ্চেতনার যোগফল এবং সেইসূত্রেই অস্তিত্ব যেখানে তৈরি হয় সহযোগী সত্তাদের সংগঠনে; অতএব দার্শনিক দৃষ্টিক্রমে কথকতায় ফুটে ওঠে এই দ্বিবাচনিক সত্য : "মানুষ? - কেবল বিরোধ আর বিরোধ। কিন্তু সে কেবল মিলন আর সামঞ্জস্যের গতিপথ তৈরি করার জন্য। সমন্বয়ের মুহূর্তটিও ক্ষণিক - কেননা মানুষ নিজের অন্তরেই বিরোধের বীজ বহন করেছে, বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, তবু সেই বিনাশের মধ্য দিয়েই তার উত্তরণ ঘটে। অন্তহীন প্রক্রিয়া" (পৃঃ ২৭৭)।

বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ ও মার্কসের মধ্যে যিনি খুঁজে পান সমন্বয় ও সামঞ্জস্য; যিনি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন, 'চিরকাল আমি এ্যান্টি-এ্যাস্টাবলিশমেন্ট'; তিনি তাঁর উপন্যাসের নায়ককে পরিশুদ্ধ করে তুলেন নিশ্চিতভাবে গাজনের 'পাটেভক্ত' হওয়ার মধ্য দিয়ে। এবং এর পরপরই তাই পাঠকৃতি দ্রুত এগিয়ে যায়। এগিয়ে যায়, কেননা, সুধীর এবার প্রস্তুত জীবনে জীবন যোগ করার সাধনায়। আমরা পাঠকৃতিতে দেখি, সরলার বিয়ে হয় যে রাতে, সে রাতেই সহিংস রাজনীতিতে বিশ্বাসী প্রবীর প্রতিপক্ষের হাতে নিহত হয়। অদ্ভুত সংযমে সুধীর এরপরও ধর্মকে

ISSN: 2278-5264

হাতিয়ার করে কর্মের পথে এগিয়ে যায়। 'শিব-শক্তি'র দ্বান্দ্বিক শক্তিকে অনুধাবন করে 'দ্রষ্টা চক্ষু'র অধিকারী মুটে সুধীর মহাজনদের কার্যকলাপ সবই জানে। একেবারে টাকার কুমির, তবুও দরিদ্র মানুষদের গলায় হাসতে হাসতেই ছুরি দিতে পারে। সুধীরের আক্ষেপ আছে তাতে, কিন্তু ক্ষোভ নেই। নীলকণ্ঠের মতোই তারও ভাবনা : "সংসারের সব মোট – অনন্ত নাগ ফণার ওপর পৃথিবীর ভার ধারণ করেছিল, তারা মুটে, সংসারের সেই মুটটা মাথায় করুক" (পৃঃ ৩১৫)।

বর্তমান এভাবেই হয়ত পৃথিবীর জঞ্জাল সরাবার জন্য প্রাণপণ করে চিরকাল, বিনিময়ে চায় ধরণীকে নতুন প্রজন্মের বাসযোগ্য করে তুলতে। গুণময় মান্না একটি সাক্ষাৎকারে নিজেই বলেছেন :

"মানুষ মাত্রেই নিজেকে ক্ষয় করে ভারবহনের গুরুদায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে – সে সর্বমানবিক প্রতিনিধি....." [৫]

-সেই দায়বদ্ধতা থেকেই উত্তর প্রজন্মকে সুধীর তার জীবনলব্ধ অভিজ্ঞতা ছড়িয়ে দিতে চায়। বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ে সে বলে ওঠে, যা উপন্যাসের আপাত-সমাপ্তিতে এসে এক ইঙ্গিতগর্ভ দ্যোতনা দিয়ে যায় : "বস্তা মাথায় দিবি, দিলি ... পা চলবে হাত লড়বে কোমর দুলবে ..... কি চৌকাট গলাবি, কি বাঁধে উঠবি ..... ও ঘাড় ঠিক সোজা রাখবি, চড়ক কাঠের মতন ....." (পৃঃ ৩৩৩)।

গুণময় মান্নার 'মুটে' উপন্যাস তাই মানুষের সামাজিক ও নৈতিক প্রগতির পথে সত্যানুগ্রাহী। যা আত্মমর্যাদাকে স্বাধীন করে তুলতে থাকে সদাসচেষ্ট। দেয় সংগ্রামের সংকল্প।

উল্লেখ সূত্র :

১। সম্পাদনা : সেনগুপ্ত বিশ্বরূপ, *উত্তরাধিকার* (গুণময় মান্না সংখ্যা), রামগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ – ৭৩৩১৩৪, অক্টোবর-ডিসেম্বর – ১৯৯৮; পৃঃ ৪০।

২। *উত্তরাধিকার*, অনুরূপ; পৃঃ ১০৯।

৩। দাশ নির্মল, *ত্রিপুরার লোকসংস্কৃতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, অক্ষর পাবলিকেশনস, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ- ২০০৩; পৃঃ ৪৬।

৪। সম্পাদক : সামন্ত সুবল, *এবং মুশায়েরা* (গুণময় মান্না সংখ্যা), কলকাতা – ৯০, অক্টোবর-ডিসেম্বর – ২০১০; পৃঃ ১৯২।

৫। *এবং মুশায়েরা*, অনুরূপ; পৃঃ ১৯৯।

আকর গ্রন্থ :

মান্না গুণময়, *মুটে*, প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা – ৭৩, প্রথম প্রকাশ – ১৯৯২।

মান্না গুণময়, *লখীন্দর দিগার*, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা – ৬, প্রথম অরুণা সংস্করণ – ১৯৮৮।

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর।